সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 31 | No. 1 | 1987

Check for updates

মুহম্মদ এনামুল হকের ভাষণ-অভিভাষণ

Volume	31
Issue	1
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ মজির উদ্দীন
Published online	October 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v31i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i1.3
Pages	77-112
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মুহম্মদ এনামুল হকের ভাষণ-অভিভাষণ

মুহম্মদ মজির উদ্দীন

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বিভিন্ন সভাসমিতিতে যে-সব ভাষণ বা অভিভাষণ দান করেছিলেন তা তাঁর জীবনদর্শন ও জীবনভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সভাপতি, প্রধানঅতিথি, প্রধানবক্তা এমনি-সব পদাধিকারে স্বীয় জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছরে (১৯৩৩-১৯৭৮) সাহিত্য-সংস্কৃতি-জীবন, চিত্রশিল্প এবং শিক্ষা-প্রসঙ্গে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ-সমূহ একদিকে তাঁর জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার পরিচয় অন্যদিকে কালের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিবর্তনের ইতিহাস। জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ ও বিবেচনা ক্ষেত্রে মুহম্মদ এনামুল হকের ভাষণগুলো প্রামাণ্য দলিল রূপে অনির্বাণ দীপবর্তিকা হয়ে আছে।

সাহিত্যের ইতিহাসরচনা এবং সাহিত্যসমালোচনায় তাঁর যে অসাধারণ দক্ষতা ছিল তা পরিকীর্ণ হয়ে আছে সংশ্লিষ্ট লিখিত ভাষণসমূহে— প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি প্রায়শ লিখিত ভাষণ পাঠ করতেন। এগুলো প্রবন্ধ-নিবন্ধরূপে বিবেচিত হবার যোগ্য। সাহিত্য সভা ও সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত অভিভাষণসমূহ বহুক্ষেত্রেই দিক্-দর্শন হয়ে উঠেছিল। তাতে এমন-সব মৌলিক বক্তব্য ছিল যে তা সৃষ্টি করতো বিতর্ক এবং আলোড়ন। জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে সাংস্কৃতিক ধারা নিয়ন্ত্রণে যখন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত শক্তিসমূহ মতলব হাসিলের প্রয়াস পাচ্ছিল তখন ডঃ হক সেই ধারাকে যথার্থ জাতীয় কল্যাণপ্রসূ করে তোলার জন্য নেতৃত্ব-মূলক বক্তব্য পেশ করেছেন। তাতে মতলব-বাজ লোকের সঙ্গে সংঘাত হয়েছে কিন্তু ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা নবচেতনার জন্ম দিয়েছে।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটি সাম্প্রদায়িক উষ্ণতা বহু কাল থেকে লক্ষ্য করা গেছে; স্বাতন্ত্র্যকামী অধ্যায় রচনার প্রয়াস

ঐতিহাসিক সত্য। আধুনিক বাংলায় সে ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী ভাবনা ক্রমাগত হয়েছিল প্রবলতর। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের জন্মলগ্ন থেকে বাংলা দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত রূপ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ (১৯০৬) প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সে পার্থক্য আরও স্পষ্ট হয় এবং স্বাতন্ত্র্যকামী সাহিত্যচেতনা একটি ধারা সৃষ্টি করে। হিন্দু-মুসলিম চেতনা সাহিত্যের নানা শাখায় উপস্থিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, 'বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালী হিন্দুর সাহিত্যে অতিরিক্ত পরিমাণে হিন্দুয়ানীর গন্ধ লাভ করে এবং ঠিক বিপরীতভাবে বাঙ্গালী হিন্দুরাও বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যে...একটু অধিক মাত্রায় মুসলমানী বা যবনত্বের গন্ধ পাইতেছে।'[১] এই অবস্থা ড. হক কোনক্রমেই পছন্দ করেননি, তিনি বলেছেন, 'উভয়ে উভয়ের প্রতি নাসিকা কুঞ্চনের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির আন্দোলন জোরে চালিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এযাবৎ আন্দোলনকারীদের কেহই ইস্‌লামী সাহিত্যের সংজ্ঞা বা ইস্‌লামী সাহিত্য বলিতে কি বুঝায় তাহা খোলাখুলিভাবে বলেন নাই বা বলিতে পারেন নাই।'[২] তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে ইসলামী সাহিত্যের মর্মার্থ না বুঝেই অনেক উচ্ছৃঙ্খল মুসলমান-সাহিত্যিক ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির নামে বাংলার সাহিত্যকুঞ্জে আগাছার সৃষ্টি করেছেন। এতে হিন্দু সাহিত্যিকগণ শিউরে উঠেছেন।

রাজনৈতিক কারণে কিছুসংখ্যক 'হিন্দু মুসলমান-জুজুর' ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেন' এবং কিছু 'মুসলমান হিন্দুরাজত্বের ভয়ে' সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। এটা সেকালের এক বাস্তব সমস্যা। ড. মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, তাতে মুসলমানের সাহিত্যসাধনায় 'যবনত্ব' এবং হিন্দুর সাহিত্যসাধনায় 'কুফরী' অনুসন্ধান অমূলক। আসলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ তা আদর্শের বিরোধ। এতে কোন জাতিরই আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। তিনি মনে করেন যে-জাতির দ্বারাই লিখিত হোক সাহিত্য যদি প্রকৃত শিল্প-সৃষ্টি হয় তবে তা জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের উপভোগের সামগ্রী হবে।[৩]

আধুনিক বাংলায় ইসলামী সাহিত্যের প্রতি এক শ্রেণীর মুসলমানের নেশা লক্ষ্য করে এবং প্রচলিত ইসলামী সাহিত্য পাঠ করে ড. হকের

ধারণা হয়েছিল যে তাঁরা ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা বা সীমা বোঝেননি। এ বিষয়ে তাঁর নিজের একটি সংজ্ঞাবোধ লক্ষ্য করা যায়, তিনি বলেছেন :

> বাঙ্গালী মুসলমান আরব পারস্য ও বাঙ্গালার সৃষ্টি।... তাহার সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে আরবের মস্তিষ্ক, পারস্যের প্রেরণা ও বাঙ্গালার প্রাণ স্ফূর্তিত ও মূর্তিত হইবে।...এই রূপে বাঙ্গালী মুসলমান যে সাহিত্য সৃষ্টি করিবে, তাহাই তাহার জন্য ইসলামী সাহিত্যে পরিণত হইবে...ইহাতে শুধু বাঙ্গালার মুসলমান অবগাহন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে না, বাঙ্গালার হিন্দুও স্নাত হইয়া গৌরববোধ করিবে।[৪]

সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন সাহিত্য-শিল্পে প্রভাব বিস্তার করে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর ঐতিহাসিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় সমাজ পরিবর্তনের গতিধারাকে অভিনিবেশসহকারে লক্ষ্য করেছেন। একজন সমাজতত্ত্বানুরাগী গবেষকের পক্ষে উদার এবং অসাম্প্রদায়িক হওয়াই স্বাভাবিক। স্বীয় সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সংকীর্ণতাকে তিনি নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভিভাষণগুলোর মধ্যে সর্বত্রই মানবিক এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয়। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শিল্পের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতিও এ-ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যিক, মহাপুরুষ এবং যুগপুরুষদের জীবনসাধনা ও জীবনদর্শনের দ্বারা তিনি নানাভাবে অনুপ্রাণিত বোধ করেছেন। গুণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন। সেখানে ধর্ম বা ব্যক্তিসত্তা কোন বাধা হয়নি। রামকৃষ্ণ পরমহংস থেকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মত স্মরণীয় ধর্মবেত্তা এবং পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ এবং বলেছিলেন যে, গুণীর প্রতি শ্রদ্ধাই মানুষকে বা জাতিকে বড় করে।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক ছিলেন গুণী এবং যুক্তিবাদী। কোন প্রকার সংস্কারের দ্বারা তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। অধ্যাপক আবুল ফজলের মানবতন্ত্র বা রামকৃষ্ণের ধর্মতন্ত্রের প্রতি তিনি মুগ্ধ থাকলেও জ্ঞানসাধনার প্রতি তিনি ছিলেন সর্বাধিক উৎসর্গীত। তিনি ভেবেছিলেন জ্ঞানসাধনাই মানুষকে মুক্তির মঞ্জিলে পৌঁছে দিতে পারে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সাহিত্যসাগর আবদুল করিম প্রমুখের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করতে গিয়ে জ্ঞানসাধনার প্রতি তিনি অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ

করেছেন। ড. হক ছিলেন শিষ্টসাহিত্যের অনুরাগী গবেষক কিন্তু নানা প্রসঙ্গে এবং বক্তৃতায় বাংলার লোকসাহিত্যবিচারে তাঁর আগ্রহ প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিম বাংলা সাহিত্য এবং সুফি-তত্ত্ব ও সুফি-সাহিত্যের গবেষক ড. হক বাঙালির ঐতিহ্য তার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিরাবেগ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন।

ইতিহাসের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং কৌতূহল এতটা প্রবল ছিল যে তিনি ইতিহাসচর্চায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পূরবী সাহিত্য-সম্মেলন, বরিশাল সাহিত্য সম্মেলন, ইতিহাস পরিষদের ইতিহাস সম্মেলন ইত্যাদি সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করেছেন। ইতিহাস সম্মেলনে তাঁর ভাষণে বাঙালির জাতিসত্তার যে সত্যপরিচয় তিনি উপস্থাপন করেছেন তা অসাধারণ প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার প্রমাণবাহী। এসব ভাষণে তিনি স্বীয় বক্তব্যকে প্রাঞ্জল, শাণিত এবং প্রমাণ-নির্ভর করে তুলেছেন। এখানে কোন ভাবের কথা নেই; আছে জ্ঞানের কথা, যুক্তির কথা এবং প্রমাণ-প্রয়োগ। জ্ঞানের কথা সর্বদাই সীমিত আবেদনের হয়ে থাকে কিন্তু ড. হকের বক্তৃতাবলী অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালোত্তীর্ণ।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক ছিলেন সাহিত্যিক এবং সাহিত্যের বিজ্ঞানী। কিন্তু ভাষণ ও বক্তৃতামালায় তাঁর জ্ঞানসীমা আরও প্রসারিত দেখা যায়। সাহিত্যিক ড. হকের চেয়ে শিক্ষাবিদ ড. হক ছিলেন আরও দূরদর্শী। শিল্পরসিক ড. হক ছিলেন আরও সূক্ষ্মদর্শী। সাহিত্যের ঐতিহাসিক শিক্ষা, শিল্প এবং সংস্কৃতির নানা অঙ্গনে বিচরণ করেছেন প্রজ্ঞার আত্যন্তিক আবেগে। তাঁর বক্তৃতাবলী পর্যালোচনা করলে সে পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ডক্টর হকের ভাষণ এবং বক্তৃতাবলীকে প্রথমত তিনভাগে ভাগ করা যায়; (১) সাহিত্য (২) শিক্ষা (৩) শিল্প। সাহিত্য-প্রাসঙ্গিক অভিভাষণমালাকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়:

১ সাহিত্যসম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ-অভিভাষণ
২ ধর্মীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ
৩ কবি সাহিত্যিকদের স্মরণসভায় বা সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ
৪ ইতিহাস সম্মেলনে ভাষণ
৫ নববর্ষ অধিষ্ঠান ও সংস্কৃতিসভায় ভাষণ।

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ, কাগজপত্র, পাণ্ডুলিপি, এবং নানাবিধ ব্যক্তিগত দলিলদস্তাবিজ আমি দেখবার সুযোগ পাই। ঐ-সব পরিত্যক্ত কাগজপত্র আমি উপর্যুক্তভাবে প্রক্রিয়াগত করি। এখানে আমি ছিন্ন ও সমগ্র, মুদ্রিত ও হস্তলেখা, বক্তৃতাবলীকে বিষয়-গতভাবে বিশ্লেষণ করতে চাই। প্রথম থেকে শেষ ভাষণে ঐকান্তিক মিল পাওয়া যাবে সে কথা আমি বলতে চাই না, তবে মোটামুটি একই মূল দর্শনের বিবর্তন ঘটেছে এগুলোতে তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। তিনি কখনো আকস্মিকভাবে পাশ কাটিয়ে যাননি।

দুই

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের প্রথম লিখিত অভিভাষণ সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম জিলা সাহিত্য সম্মিলনী (রাউজান অধিবেশন)-এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ (৮ই মে, ১৯৩৩)। তখন তিনি এম. এ. (১৯২৯) পাশ করে গবেষণাকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। একজন তরুণ গবে-ষকের পক্ষে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ, গৌরবের কথা। দীর্ঘ ১৯ পৃষ্ঠার মুদ্রিত 'অভিভাষণ' ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর একটি নিবন্ধরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য। এর প্রথম পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যে রাউজানের অবদান আলোচিত হয়েছে। কবি নবীনচন্দ্র সেন, আবু মা-আলী মোহাম্মদ হামিদ আলীর অবদান তিনি স্মরণ করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। সমাজসচেতন দৃষ্টিতে সেদিন তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মৌল প্রবণতাটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন উত্তরকালে প্রণালীবদ্ধ গবেষণায় তা-ই ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন:

> পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাবে অধুনা হিন্দু জাতির মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ ও নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে এবং আত্মবিস্মৃত মুসলমান জাতির মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক রং পরিবর্তনের গোড়ায় তাহাও নিরন্তর রস সিঞ্চন করিয়া আসিতেছে।[৫]

মুসলমান জাতির স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি সাহিত্যে রং পরিবর্তনের গোড়ায় রস সিঞ্চন করেছে এমন মন্তব্য সর্বমহলে সমানভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। তবে স্বাতন্ত্র্যকামী একটি বলিষ্ঠ ধারা ক্রম-প্রবাহিত হয়ে বর্তমানে

এসে পেঁৗচেছে একথা ঐতিহাসিক সত্য। তা শুধু স্বাতন্ত্র্যকামিতাই উজ্জীবিত করেনি, শিল্পের এক অভিনব পরাকাষ্ঠাও রচনা করেছে। উপাদান, আদর্শ এবং শিল্পকৌশলে এ-সাহিত্যধারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে আদর্শের ঔদার্য এবং সর্বগ্রাহ্যতা যেখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেখানেই সাহিত্যের গৌরবও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ধর্মীয় গোড়ামি এবং রাজনৈতিক অবিশ্বাস এজন্য দায়ী।

'যবনত্ব' ও 'কুফরী' আবিষ্কারকদের প্রতি বিরক্ত মুহম্মদ এনামুল হক সাহিত্যজীবনের সেই উষালগ্নেই উভয়ের মিলন কামনা করেছিলেন। মুসলমানদের রচিত সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন এবং তাদের সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্য করে তোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃতি এবং রূপ কেমন হবে সে সম্পর্কে তিনি ইঙ্গিত দান করেছিলেন। অবশ্যি তা অনেকটা কালের মানস দ্বারা প্রভাবিত। কসাসুল আম্বিয়া বা রাহেনাজাত ধরনের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস কতটা কল্যাণপ্রসূ হবে তা কাল বিচার করবে কিন্তু 'মুসলমানী বাঙ্গালা' নামে যে 'অদ্ভূত বাঙ্গালা' প্রচলনের চেষ্টা হচ্ছে তা ভাষা-সাহিত্যে কোন কল্যাণই আনবে না।

এ-অভিভাষণের উপসংহারে তিনি সবাইকে সাহিত্যের 'রসলোকে' আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মুসলমানদেরকে তিনি মুসলমানরূপেই জীবন ও মৃত্যু বরণের আহ্বান জানিয়ে তাদের সাহিত্যকে 'বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদে পরিণত' করবার সাধনায় আত্মনিয়োগের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

১৯৩৭ সালের শেষ দিকে পূরবী লেখক গোষ্ঠীর উদ্যোগে চট্টগ্রামে 'পূরবী সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।[৬] সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক। ২৩ পৃষ্ঠার মুদ্রিত সভাপতির ভাষণে তিনি উপস্থাপন করেছিলেন 'চট্টল সংস্কৃতির গোড়ার কাহিনী'। এ-ভাষণের প্রথম পর্যায়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তির ইতিহাস। চট্টগ্রামকে তিনি 'চাটিগাঁ' নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী। স্বীয় বক্তব্যের অনুকূলে তিনি বলেন :

> এ জেলার শতাধিক বৎসরের ঊর্ধ্বকালের প্রাচীন পুথিপত্র ও কাগজে দেখা যায় এ জেলার নাম "চাটিগাঁও" বা "চাটিগাঁ" বা

"চাটিগা"। তিব্বতের লামা তারানাথের "খাব্‌ব্‌ দুনদন" বা তথাকার সাম্প খনপোকৃত প্রাচীন "পগমস জোন্‌জন্‌" নামক গ্রন্থগুলিতেও এ জেলার নাম "চাটিগ্রাম" বলিয়া পাওয়া যায়। সুতরাং খ্রীস্টীয় অব্দের গোড়ার দিকেও এ জেলার সাহিত্যিক নাম 'চাটিগ্রাম' এবং সম্ভবত কথ্যনাম চাটিগাঁ বা চাটিগাঁও ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।[৭]

ইবনে বতুতা কথিত 'শাৎকাওন' (আরবী চং-এ শাতিউ কাউনিন) শাতিকওন অর্থ সমুদ্র তীরবর্তীভূভাগ) সম্ভবত আরব বণিকদের বা প্রাচীন অধিবাসীদের চাটিগাঁও নামের আরবী-বিকৃতি। দশম শতাব্দীর প্রথম পাদে আরাকানী মগরা এ জেলাকে জয় করে নাম দিয়েছিল 'চেত্তগৌং'। এটি প্রাচীন চাটিগাও নামের আরাকানী অপভ্রংশ। এই অর্থপূর্ণ এবং স্মৃতিবিজড়িত নামকে অবহেলা করলে ঐতিহ্যের অবমাননা করা হয়। চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখকগণ এর যে ৩২টি নাম উল্লেখ করেছেন 'চাটিগাঁ' তার অন্যতম।[৮]

চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করে ড. হক এর জনমণ্ডলী, ধর্ম, সমাজ, ভাষা-সাহিত্য, বহিরাগত প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসরচনার উপাদানের পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। এই ইতহাস রচনার সাধারণপন্থা নির্দেশ করে তিনি যে রূপরেখা দান করেন তা মূলত এইরূপ:

১ দ্রাবিড়েরাই এই জেলার আদিম অধিবাসী; জেলার ভাষায় দ্রাবিড় ভাষার শব্দ তার প্রমাণ। আর্যরা দ্রাবিড়দের বিতাড়িত করেনি। জুমিয়া, চাকমা, কুকি প্রভৃতি পার্বত্য জাতি এবং তদের পূর্বপুরুষরাই ছিল দ্রাবিড় জাতির পরমশত্রু। এই পার্বত্য জতিসমূহ দ্রাবিড় জাতি থেকে উন্নত সভ্যতা নিয়ে তিব্বত থেকে ব্রহ্মদেশের ঐরাবতী নদীপথে এ জেলায় প্রবেশ করে থাকবে। খ্রীস্টপূর্ব হাজার বছর থেকে ৩-৪ শত বছরের মধ্যে এরা এ জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এরা তিব্বতী-ব্রহ্মী (Tibeto-Burman) নামে পরিচিত।

২ এদের পরেই এখানে আর্যসভ্যতা প্রবেশ করে। এই আর্য-সভ্যতা প্রাচীন বৈদিক বা উপনিষদের যুগের আর্যসভ্যতা

নয়। হিন্দু সভ্যতা সে যুগে মালয়, জাভা, শ্যাম কম্বোডিয়া প্রভৃতি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই যুগে মূল ভারত থেকে জলপথে তা চাটিগায়ে প্রবেশ করে।

৩ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আর্য সভ্যতার প্রবেশ ও প্রসার। ৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে মঘীসন চাটিগাঁয়ে প্রচলিত হয়; তবে কি এ বছরেই মঘ-আখ্যায়িত আরাকানী বৌদ্ধদের দ্বারা চট্টগ্রাম বিজিত হয়েছিল? সে যাই হোক চট্টগ্রামে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাব এক স্থায়ী ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

৪ বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে চট্টগ্রামে যে-সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল তা মুসলিম সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি তুর্কি-পাঠান-মুঘল কর্তৃক আনীত মুসলিম সংস্কৃতি নয়, তা 'খাস আরবীয় মুসলিম সংস্কৃতির আমদানি থেকে সাধিত। খ্যাতনামা আরব ভৌগোলিক এবং পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে জানা যায় খ্রীস্টীয় ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত মেঘনা নদীর পূর্ব তীর আরব বণিকদের কর্মতৎপরতায় ভরে উঠেছিল। চট্টগ্রামের আরবীয় উপনিবেশ এবং সংস্কৃতি-প্রভাব ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

৫ ফখরু-দ্-দীন মুবারিক শাহের (১৩৩৬-১৩৫২) কালে তুর্কী বিজয়।

৬ অতঃপর আরাকানী বিজয়।

৭ এর এক শতাব্দীর পর জালালুদ্-দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৪-১৪৩১) কর্তৃক চাটিগাঁ পুনর্বিজিত হয়। এ বিজয় বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ত্রিপুরার মাণিক্য বংশীয় চাকমা রাজাগণ এবং আরাকানী মঘ রাজাগণ সীতাকুণ্ড পর্বতের পশ্চিম ও পূর্বভাগ শাসন করেন প্রায় ৭০ বছর ধরে।

৮ অতঃপর গৌড়াধিপতি হুসয়ন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) আবার চট্টগ্রাম জয় করেন। এর পর চট্টগ্রাম বরাবরই মুসলিম শাসনাধীন ছিল।

৯ ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব আন্দোলনে চাটিগাঁয় এক নতুন ভাবপ্লাবনের সৃষ্টি হয়—এর প্রভাব অতি গভীর। তবে তা ভাবজাগতিক, রাজনীতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না।

১০ এই প্রভাবের কিছুকাল পরেই এ জেলায় মুঘল সভ্যতার ঢেউ লাগে। আকবরের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম মুঘলরা জয় করে। হার্মাদ ও মঘ-জলদস্যুদের উৎপাত মুঘলদের খুবই উৎপীড়িত করে। আওরঙ্গজেব-সেনাপতি মীর জুমলা এবং পরে শায়েস্তা খাঁ এ উৎপাত নির্মূল করেন।

এই বিচিত্র নৃতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানে চট্ট-গ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার যে আহ্বান ড. হক জানিয়েছিলেন তা গবেষকদের কৌতূহল আকর্ষণ করে থাকবে। এই বিষয়বস্তুকে ৬টি পর্বে ভাগ করে উল্লেখযোগ্য অনুসরণীয় দলিলের তালিকা অভিভাষণের শেষ দিকে সংযোজিত করেছেন। এতে ফুটে উঠেছে ড. হকের গভীর ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা, সংস্কৃতি-অনুরাগ ও দেশপ্রেম।

১৯৪৩ সালের ১৩ই মার্চ, মালদাহে রামকৃষ্ণ পরম হংসের শতোত্তর অষ্টম বর্ষীয় শুভ জন্মোৎসব উদযাপন উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যে ভাষণ দেন তা অভাবনীয় সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। রামকৃষ্ণের আদর্শ ও জীবনবাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন: 'ভগবানকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার ফলে তিনি বুঝলেন যে ধর্মে ধর্মে কোন বিরোধ নেই; কেননা সকল ধর্মের উদ্দেশ্যই হ'ল ভগবৎপ্রাপ্তি। ধর্ম কেবল ভবগানকে পাবার পন্থামাত্র।[৯]

সমকালীন বাংলাদেশের মানুষের দুঃখদুর্দশার কারণসমূহ তিনি অত্যন্ত বেদনার্ত হৃদয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। ওলাওঠা, ম্যালেরিয়া, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি বিধাতার অভিশাপের মত আমাদের ওপর চেপে থাকে। তারপর বিশ্বধ্বংসী মহাসমর যমের মত মানুষের ঘাড়ে চেপেছে। সব চেয়ে বড় 'অভিশাপ এদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ধর্মের নামে এমন অধর্মের অনাচারের জোড়া সারা পৃথিবীতে আর নেই।' এই আধি-ব্যাধি সাম্প্রদায়িকতা-জর্জর বাংলাদেশে পরমহংস দেবের আদর্শ এবং বাণী অন্ধকারে আলোরূপে কাজ করবে। ড. হক বলেছেন:

'সাম্প্রদায়িতকা আর নারী ধর্ষণের সময়ে ধর্মের নামে অধর্মের প্রাবল্যের কালে বাংলায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ফিরে আসুন...তাঁর জীবনের আদর্শে বাঙ্গালী উদ্বুদ্ধ হোক।' এই আহ্বান চল্লিশের দশকের দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের পটভূমিতে এক গভীর আশার বাণী। সত্য সুন্দর অহিংসার প্রতি ড. হকের ছিল স্বাভাবিক আকর্ষণ। মহাপুরুষ রাম-কৃষ্ণের দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাবান বক্তা বিশ্বাস করতেন তাঁর 'কাছে এদেশের সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্মই সমান বলে বিবেচিত হয়েছিল, তাঁর কাছে ধর্মে ধর্মে কোন বিরোধ ছিল না, তাঁর কাছে মানুষ মাত্রেই ভগবানের সন্তান বলে বিবেচিত হ'ত।'[১০]

'মহাযোগী' রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিদ্ধিলাভের ব্যাপারকে ড. হক যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, শরিয়ৎ-পাবন্দ্‌রা হয়তো ক্ষুব্ধ হবেন কিন্তু তিনি অকুতোভয়ে বাস্তবকে প্রকাশ করেছেন:

> ভগবান যখন প্রকাশিত হন, তখন বিচিত্ররূপেই দেখা দেন। তাঁর প্রকাশ হয়ে ওঠে বিচিত্র ও তাঁর অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে অপরূপ। লোকের ধারণার বাইরে তাঁর কাজ, মানুষের জ্ঞানের সীমার বহু দূরে তাঁর বৈচিত্র্য।... কামারপুর গ্রামের এই অশিক্ষিত যুবকটি ভগবান প্রকাশের জন্য বেছে নিলেন,...ভগবান তাঁকে আশ্রয় ক'রেই বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হলেন।

দেশের দুর্দশার কিসে অবসান হবে সে ব্যাপারে ড. হকের মনে একটি দৃঢ় প্রত্যয় ছিল——সে হল মহাপুরুষ-জীবনাদর্শ দাঙ্গা, মহামারী, পাশব-আচারণকে দূর করতে পারে। তাই রামকৃষ্ণের জবানীতে তিনি বলেছেন: 'ভগবানকে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি কর——সব বিবাদ বিসংবাদের অবসান হবে···।' রামকৃষ্ণ যে দর্শন প্রচার করলেন ——'মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হলো অন্তরে বাইরে ভগবানের উপলব্ধি ও ভগবানের সাক্ষাৎলাভ'——তা সকল আস্তিক্যবাদী দর্শনেরই মূল কথা। তাই ড. হক রামকৃষ্ণের বাণীকে সত্য বলে মনে করেছেন। এ-সত্যকে তিনি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন:

> সমস্ত ধর্মকে নিয়ে যদি একটি বৃত্ত কল্পনা করা হয়, তার কেন্দ্র হয় ভগবান। এই বৃত্তের পরিধি থেকে যতটা ব্যাসার্ধ

টানা যাক সব ক'টা ব্যাসার্ধ কেন্দ্রে গিয়ে মিশবেই। এই ব্যাসার্ধগুলিই বিভিন্ন ধর্ম। সুতরাং যে কোন ব্যাসার্ধ পথেই এগোন যা'ক, যে কোন ধর্মই অবলম্বন করা যা'ক, কেন্দ্রে অর্থাৎ ভগবানে পৌঁছানো যাবেই যাবে। অতএব ধর্মে ধর্মে কোন গোল নেই।[১১]

রামকৃষ্ণ পরমহংসের এই সত্যবোধকে ড. হক 'রিয়াজুস সালাতীন'-প্রণেতা গোলাম হোসেনের একটি পারসি স্তবকের বঙ্গানুবাদ করে বুঝিয়েছেন:

ধর্মাধর্মের কোন্দল যত একখানে মিশে যায়
স্বপন সে এক বিবিধ মুখে সে বিবিধ ব্যাখ্যা পায়।

আলোচ্য ভাষণের উপসংহারে ড. হক বলেছেন সাম্প্রদায়িকতা আর নারীর অমর্যাদার প্রাবল্যে বাংলায় বিধাতার অভিশাপ নেমে এসেছে। যোগী রামকৃষ্ণের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে তা অনুসরণ করলে এ-অভিশাপের অবসান হতে পারে। ভাষণটিতে বক্তার হৃদয়-বোধ ধর্মবোধ ও মুক্তবুদ্ধির সমন্বয় ঘটেছে। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনো-ভঙ্গি উদার এবং র‍্যাশনাল।

তিন

সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর বাংলা ভাষা-সাহিত্যে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যে সব সমস্যা দেখা দিল সে সম্পর্কে নতুন দিক্-নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে প্রগতিশীল বিবর্তনমুখী প্রক্রিয়ার সমর্থক হিসেবে ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। নতুন দেশের সাহিত্যের বিষয়গত আদর্শ এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নতুন পরামর্শ ও নির্দেশাদি বিশেষ-বিশেষ মহল দান করতে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, ফলে সমস্যারও জট পাকলো। তথাকথিত ইসলামী আদর্শ, রুশীয় ভাবধারা, পাকিস্তানী আদর্শে বাংলা ভাষার সংস্কার ক্রমেই সমস্যার ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করলো।

প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মৌলবাদীদের সংঘাত অন্তরে-অলক্ষ্যে শুরু হয়ে গেল। ড. হক বিবর্তনের-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা-সমস্যা পর্যায়ে তাঁর প্রথম বলিষ্ঠ মতামত ব্যক্ত হয় 'পূর্ব পাকিস্তানের

রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' (নভেম্বর ১৯৪৭) প্রবন্ধে। সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এবং সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে দূরদর্শী দিক্‌নির্দেশনা ছিল রাজশাহী সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে (১৯৫১)।

বিভিন্ন সময়ে ড. হক বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীতে লিখিত ভাষণ দিয়েছেন---বিভাগোত্তরকালে নজরুলের ত্রিপঞ্চাশোত্তম জন্মতিথিতে প্রদত্ত ভাষণই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রথম ভাষণ। কবি নজরুলের প্রতি ড. হকের শ্রদ্ধাবোধ ছিল আবাল্য। এই শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপই তিনি তাঁর 'ঝরণাধারা' কাব্য বিদ্রোহী কবির নামে উৎসর্গ করেন। জন্মদিবসের ভাষণে ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন: 'আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কবি নজরুল ইসলামের সাংস্কৃতিক দান জ্ঞানে বা অজ্ঞানে স্বীকৃত'...।[১২] জাতীয় জীবনে তা 'সঞ্চারিত ও প্রকাশিত'। ১৯৫১ সালে নজরুল-প্রাসঙ্গিক এই মূল্যায়ন উত্তরকালে হয়েছে নজরুলচর্চার দিগ্‌দর্শন। এ সময়টি ছিল নজরুল-বিতর্কের শেষ পর্যায়; ডক্টর হকের বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে তখনো দু'ধরনের লোকের মধ্যে তাঁকে 'জাতীয় কবি' বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠা ছিল, এক. কাঠমোল্লাদল। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত নয় বলে তাঁরা ক্ষমার যোগ্য। দুই. সারা জীবন বাংলা সাহিত্যের সেবাকারী কেউ-কেউও বাংলা সাহিত্যসেবকদের বলেন অনৈসলামিকতার ভূতাবশিষ্ট। এদের ড. হক বলেছেন 'স্বার্থের দাস' 'নেমকহারাম'। নজরুলকে তিনি 'যুগ-প্রবর্তক' এবং 'জাতীয় কবি' বলে নিজেদের গৌরববোধ প্রকাশ করেন।

যুদ্ধোত্তর বাংলা কাব্যে নির্মিতি এবং ভাবসম্পদে নজরুল অভিনবত্ব আমদানি করেছিলেন। সাম্য, আত্মচেতনা আর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবার কাব্যে রূপায়িত হলো। রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতিকে তিনিই প্রথম কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠা করলেন। 'তাঁর প্রতিভার কল্যাণে বাঙালী আজ ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা বাংলার বুকে বসে পারস্যের গোলাপ বুলবুলের অনুরাগ, সাকী সরাবের মধুর মাদকতা এবং সরাইখানার মধুর উল্লাস অনুভব করতে সমর্থ হয়েছে।'[১৩]

অতঃপর, তাঁর ভাষণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ১৯৫১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে রাজশাহী জিন্নাহ্ ইসলামিক ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত

সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ। ভাষণটি ইনস্টিটিউটের বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের ধারা 'এই শিরোনামে (১৯৫১)। দেশভাগের আগেও 'আমাদের সাহিত্য, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের বৈশিষ্ট্য ও জাতীয়তা সম্বন্ধে' আমরা কিছুটা সজাগ হয়েছিলাম কিন্তু দেশবিভাগের পর নতুন যুগের নবীন আবহাওয়ায় অভিনব সাহিত্য-সৃষ্টির তোড়জোড় চলছে।' এর মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার অভাব ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য কোন্ কোন্ খাতে বইছে তার সম্ভাবনাই বা কতটুকু এ বিষয়ে ভেবে দেখা দরকার।

আমাদের রাষ্ট্র ইসলামী বলে আমাদের সাহিত্যও হবে ইসলামের পরিপোষক। সাহিত্যের ইসলামী ধারা হচ্ছে ইসলামী আদর্শ অনুসরণের উৎস থেকে প্রবাহিত। এই ধারার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ডঃ হক বলেছেন:

> আমাদের সাহিত্যে ইসলামী ধারার প্রথম খাত হচ্ছে ওঁদের, যাঁদের ধারণা—আমাদেরকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীনযুগের প্রাথমিক ইসলামে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু বর্তমানের সাথে, যোগাযোগ রেখে কিভাবে সে যুগে ফেরা যায় তার কোন হদিস তাঁরা দিতে পারেননি।... বাংলা সাহিত্যে এঁরা যেন মুরুব্বির আসন দখল করে নিতে চান, নেহাত গায়ের জোরে। যেখানে সেখানে ইসলামী আদর্শের জিগির ছাড়াই যেন এঁদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এঁদের পুরোভাগে আছেন বুলবুলিস্তানের কবি গোলাম মোস্তফা সাহেব।[১৪]

ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবি গোলাম মোস্তফা এবং তাঁর দলের সৃষ্ট সাহিত্যে ইসলামের প্রাচীন যুগে ফিরে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখতে পাননি। তিনি মনে করেন তাঁদের সৃষ্টিকে ইসলামী আদর্শপূর্ণ সাহিত্য বলে গ্রহণ করা যায় না কারণ শাস্ত্রীয় ইসলামে প্রতীকপ্রবণতা নেই কিন্তু কবি গোলাম মোস্তফা-র 'পাকিস্তানের গান'-য়ে প্রতীক-আভাস আছে। এখানে ড. হক প্রশ্ন করেন: 'হিন্দুরা যাকে 'ভারতমাতা' কথায় রূপ দেন আমাদের কবি কি তার মাতৃত্বটুকুকে পিতৃত্বের বা পুরুষের প্রসাধনে ঢেকে তাকে আমদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেননি?'[১৫] কবির 'কে শোনাবে প্রেমের বাণী,' 'কে মিলাবে আরব-আজম'...'পাকিস্তান

সে পাকিস্তান' বাক্যাংশগুলোর 'কে' এর মধ্যে যেন এক জৈবসত্তাধারী প্রতীক সমুপস্থিত। তাই গোলাম মোস্তফার কবিতাকে ইসলামের আদর্শানুসরণ বলতে ড. হকের আপত্তি। এদের কথায়-কাজে রয়েছে অসামঞ্জস্য. চিন্তায় বিভ্রাট'; 'নামজাদা কোন সংস্কৃতির বিবর্তন সম্পর্কে 'মুসলিম-সংস্কৃতির কালোপযোগী রূপ' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই ইসলামী আদর্শের 'জিগির' এদের আরম্ভ এবং শেষ।

ফতোয়াধারীদের আর একটি উপধারা প্রসঙ্গে ড. হক শ্রোতৃ-মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এটি হলো উর্দু-প্রীতি। তাঁরা মনে করেন উর্দুভাষায় যা আছে তার সবই মুসলমানী। সুতরাং 'উর্দুকে ছেড়ে যাঁরা বাংলাভাষার সেবা করেন' তাঁদের মতে তাঁরা 'ইসলাম-বিরোধী'। এই উপধারার 'পুরোভাগে রয়েছেন খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'। এরা বাংলা সাহিত্যের ব্যবসা করেন এবং জীবিকার প্রধান অবলম্বনরূপে বাংলাভাষাকেই গ্রহণ করেন, এমন কি বাংলা ভাষাতেই বাংলাভাষার কুৎসা রটনা করেন'... প্রকারান্তরে ইঙ্গিতও দিতে চান বাংলাভাষার সাধকেরা ইসলাম বিরোধী বলে রাষ্ট্রদ্রোহীও বটে'।[১৬] ... ইত্যাদি।

উর্দু-প্রেমিকদের তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে উর্দুর সব কিছু ইসলামী হলে নিশাতীর 'ফুলবন' গওয়াসীর 'সয়ফুল মুলক' (১৬২৫), আমানতের 'ইন্দর সভা' (১৮৫৩), হাসান নিজামীর 'কৃষ্ণবীথি', ইকবালের 'হিমালা' প্রভৃতিকে ইসলামী না বলে উপায় কি? তাছাড়া বাংলায় যা আছে সবই হিন্দুয়ানী এসব ব্যবস্থাপত্র মাথা পেতে নেওয়া যায় না; তা হলে মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু', বরকতুল্লাহ্'র 'পারস্য-প্রতিভা', ইয়াকুব আলীর 'শান্তিধারা', স্বয়ং আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' হিন্দুয়ানীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে।

পুনর্জাগরণের কণ্টকল্পনায় সোনাভান থেকে গুলে বকাউলী এবং শাহজাদা শাহজাদীতে পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যকে নবরূপ দিতে চান এ-ধরনের আদর্শবাদে শ্রদ্ধা পোষণ করা যায় না। বিষয়বস্তুর এই অসামঞ্জস্য ড. হক তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট করে তুলে --এর ভাষা নির্মাণে এবং জীবনচিত্র রূপায়ণে কথিত গোষ্ঠী যে উদ্ভট পন্থা অবলম্বন করেছেন তা যেমন যুক্তিসহকারে তেমনি শাণিত বিদ্রূপে

উপস্থাপন করেন। এই ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যের ধারা বলতে তিনি ইসলামী ধারার যে গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন তা মোটামুটি:

১ কবি গোলাম মোস্তফা এবং তাঁর গোষ্ঠীর ইসলামী আদর্শ—প্রাচীন যুগের ইসলামে ফিরে যাবার প্রয়াস। এঁদের রচনায় ড. হক ইসলাম বিরোধী প্রতীকপ্রবণতা লক্ষ্য করেছেন।

২ উর্দু-প্রীতি—উর্দুভাষায় যা আছে তার সবই মুসলমানী।

৩ ইসলামী-পুনর্জাগরণবাদী—ফররুখ আহমদ এবং তাঁর দল। প্রাচীনের প্রতি মোহবশেই গোলে বকাউলি আর সিন্দাবাদের কাহিনী কিছুকাল লোকের মনোরঞ্জন করবে। সে মোহটুকু কেটে গেলেই এগুলো অপাংক্তেয় হয়ে পড়বে।

৪ পাশ্চাত্যের জড় প্রভাব। এর দ্বারা আমরা আক্রান্ত হলেও প্রভাবিত হইনি।

৫ রুশীয় প্রভাব।

৬ গণতান্ত্রিক ধারা। রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রবোধের কারণেই সাহিত্যিক গণতন্ত্রের একটা অজ্ঞাতক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে। ড. হকের মতে সাহিত্যিক গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের অগ্রদূত। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যারা জনগণের প্রতিনিধি তাঁরা রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-ইকবাল-বানার্ড শ প্রমুখ অসাধারণ ব্যক্তি। এঁরাই জাতির ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতির বাহক, ধারক ও সংস্কারক।

সাহিত্যে-গণতন্ত্র বলতে ভাষার প্রসঙ্গটিও এসে পড়েছে। আমাদের সাহিত্যে সাধারণ পল্লীমানুষের জীবন রূপায়িত হোক। ড: হক লক্ষ্য করেছেন তরুণদের রচনায় এ-প্রবণতা আসছে। কিন্তু কোন কোন মহল যে সাধারণ সহজবোধ্য গণ-ভাষা দাবি করছেন তা সাহিত্য বা শিল্পকলার ক্ষেত্রে চলে না! কারণ পৃথিবীর কোন মহৎ সাহিত্যই গণভাষায় রচিত হয়নি। সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে ভাষার ছলাকলা বা শিল্প-সুষমা প্রয়োজন। তা ছাড়া সাহিত্যের সকল বিভাগের ভাষা একরূপ হতেও পারে না। যেমন নাটকের সংলাপ এবং দর্শনের ভাষা যদি এক হয় তবে নাটক নাটকই নয়। ড. হক বলেছেন, পৃথিবীর

কোন সুসভ্য দেশে ইতিহাস ভূগোল দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি জটিল বিষয়াদি জনসাধারণের মুখের ভাষায় লেখা হয়নি। এ-থেকেই পাকিস্তানী বাংলা সাহিত্যের ভাষার রূপ কেমন হবে তা বোঝা যায়।

বাংলা ভাষার সার্বজনীন সাহিত্যিক রূপই স্বাভাবিক। কারণ এ রূপ বহু শতাব্দী-বিবর্তনের ফল। একে অকারণে আঞ্চলিক করে তুলতে চাওয়া এবং জোর করে অপ্রয়োজনীয় বিদেশী শব্দ প্রবিষ্ট করানোতে ভাষা স্বাভাবিক বিবর্তনের গতি হারিয়ে ফেলবে। তাকে বিবর্তনের স্বাধীনতা দেওয়াই হবে সর্বাধিক কল্যাণের ব্যাপার।

এই অভিভাষণের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দূরপ্রসারী—কবি গোলাম মোস্তফা এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ এবং তাঁদের দলবল নওবাহার, আজাদ, মোহাম্মদী ইত্যাদি পত্রিকায় ড. মুহম্মদ এনামুল হকের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ এবং অশালীন আক্রমণাত্মক সমালোচনা করে চলেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে।[১৭] তাতে তিনি সম্ভবত মর্ম-পীড়িত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ক্ষতি হয়নি। তবে আশার কথা এই যে, এ-ভাষণে তিনি যে সাহসী দিক্‌নির্দেশ করেছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য লাভ করেছে তার যথার্থ সুফল।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের (১৮৬৯-১৯৫৩) দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী ১৯৫৫-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সভায় সভা-পতির ভাষণে ড. হক সাহিত্যবিশারদের কর্ম ও সাধনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর প্রাচীন পুথি আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে জাতির প্রাচীন সাহিত্যসাধনার সৌধ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই মহৎ সাধকের জীবন ও কর্মের প্রশংসা ও পরিচয় খুবই কম। ড. হক এ-ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছেন।

এই ভাষণে তিনি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন এবং তাঁর সাধনার পরিচয় বিশ্লেষণ করেন। সাহিত্য-বিশারদ পুথি সংগ্রহ করেছেন এবং মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। ফলে তাঁর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রাচীন পুথির বিবরণ রচনা এবং সম্পাদনার আহ্বান এসেছিল সাহিত্যবিশারদের কাছে। মুহম্মদ

এনামুল হক বলেছেন 'তিনি প্রাচীন পুথির বিবরণ রচনার যে আদর্শ স্থাপন করেন তা আজও মুখ্যত অনুসৃত হচ্ছে।'[১৮] এফ. এ. পাশ মুন্সী আবদুল করিম প্রাচীন পুথির বিবরণ রচনার 'মেথড-'-এর জন্ম দিলেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাসরচনায় সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত উপাদান প্রভূত সহায়ক হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'[১৯] গ্রন্থে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন বলে ড. হক তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। সুচক্রদণ্ডী সাহিত্যতীর্থে পরিণত হয়েছিল। ক্ষিতিমোহন সেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ সেখানে গেছেন। ডক্টর হক সাহিত্যবিশারদের সুচক্রদণ্ডীর বাড়িতে আতিথ্য নিয়ে তাঁর 'পদতলে বসে' তাঁর সঞ্চিত উপাদানের ওপর ভিত্তি করে লিখলেন 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য'। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ লেখক নিজ নামের সঙ্গে জুড়ে দিলেন সাহিত্যবিশারদেরও নাম। একজন দানে মহান অন্যজন কৃতজ্ঞতায়।

বাংলা লোকসাহিত্যের প্রতি ড. হকের ছিল বিশেষ কৌতূহল এবং পরম অনুরাগ। শিষ্টসাহিত্য এবং লোকসাহিত্যের তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'শিষ্টসাহিত্যের জন্ম বুদ্ধিজীবী ভদ্র সমাজের মস্তিষ্কে আর লোকসাহিত্যের জন্ম জনসমাজের হৃদয়ে--লোকসাহিত্যের ক্ষেত্র দেশজোড়া, শিষ্টসাহিত্যের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ' (মনীষা মঞ্জুষা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭)। লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ বহুদিন আগে থেকে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। এ বিষয়ে কমপক্ষে তিনি ৫টি প্রবন্ধ লিখেছেন। এর দুটি ভাষণ। প্রথমটি বরিশাল সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন (১৯৫৭) উপলক্ষে লোকসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ। পরে এটি প্রবন্ধাকারে 'মনীষা মঞ্জুষা' প্রথম খণ্ড (১৯৭৫) সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাষণ বাংলাদেশ বেতার-এর ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস কর্তৃক আয়োজিত (১২ই ডিসেম্বর ১৯৭৩) 'লোকসংস্কৃতি সপ্তাহে' উদ্বোধনী ভাষণ।

বরিশাল সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণটি লোকসাহিত্য-গবেষকদের নিকট একটি মূল্যবান দিক-নির্দেশনা এবং বিরাট বাংলা লোকসাহিত্যের পরিধিগত একটি চমৎকার রূপরেখা। এর বহুবিচিত্র

শাখা-প্রশাখার তিনি মর্যাদাপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ এবং সুশৃঙ্খল পরিচয় দান করেছেন। জনসমাজের সঙ্গে এ-সাহিত্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. হক বলেছেন:

> দেশজোড়া লোকসমাজ যেই সাহিত্যের সঞ্জীবনী-সুধা পান করিয়া আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে সেই সাহিত্যের নাম লোক-সাহিত্য...ইহা সর্বপ্রকারে গ্রামীণ...লোক সাহিত্যে সজীবতা আছে, সর্বোপরি আছে সহৃদয়তা। (ঐ পৃ. ৫৬)।

শিষ্টসাহিত্যের বিদগ্ধ গবেষক কিভাবে লোকসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হলেন তা বিস্ময়কর। এর অকৃত্রিম রস-উৎসার এবং সহজ সরল পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এর রসোপলব্ধি সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন বাংলার সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, মনোবৈজ্ঞানিক এমন কি ঐতিহাসিক উপাদানও লোকসাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। তাঁর মতে সুবিশাল লোকসাহিত্যের অতি অল্পই সংগৃহীত এবং আমাদের গোচরীভূত হয়েছে। এর সকল দিক উদঘাটিত হলে এক অভাবিতপূর্ব রসলোক উন্মোচিত হবে।

এই প্রত্যাশা এবং বিশ্বাস-নির্ভর অভিভাষণের দুই দশকের মধ্যে সংগ্রহ, বিচার, সম্পাদনা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, পঠন-পাঠন এবং গবেষণা তাঁর প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরণ করেছে। তাই আমাদের মনে হয় ড. হকের প্রত্যাশা এবং প্রেরণায় বাংলা লোকসাহিত্য-গবেষণা আন্তর্জাতিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পরবর্তীকালে ডক্টর হক লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে—তার রূপ এবং চারিত্র বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশকালে তিনি বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে জাতিসত্তার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন।

১৯৫৮ সালে নওরোজ সাহিত্য মজলিশে (দিনাজপুর) ড. হক সভাপতি হিসেবে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫১ সালে রাজশাহী সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে যে সব মূল সমস্যার প্রতি দিক্-নির্দেশনা ছিল এ-ভাষণটি তারই পরিপূরক বলে মনে হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে ড. হক ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাই বাংলা ভাষার অবস্থা এবং অবস্থান, গতি এবং প্রকৃতি

সম্পর্কে মতামত প্রদানের বেলায় তাঁর বক্তব্য যথার্থ গুরুত্ববাহী বলে মনে করবার কারণ আছে। তাত্ত্বিকভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা যে সঞ্চয় করবে, তার যে বিশিষ্ট সামগ্রিক রূপ স্ফূর্ত ও মূর্ত হবে তারই নাম 'পূর্ব পাকিস্তানী বাংলাভাষা ও সাহিত্য'।

তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল: পাকিস্তানী তথা পূর্ব পাকিস্তানী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ, ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ থেকে পৃথক... রূপের দিক থেকে যেমন উভয়ই পরস্পর পৃথক. প্রকৃতির দিক থেকেও একের মেজাজ অপরটি থেকে আলাদা।[১৯ক] বিবর্তনের ধীর গতিতে পাকিস্তানী বাংলা ভারতীয় বাংলা থেকে 'বুদ্ধিগ্রাহ্য পরিবর্তন' ও 'দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপ' দেখা দিয়েছে। অকস্মাৎ 'পাকিস্তানী বাংলার গায়ে কুর্তি-কোর্তা পরিয়ে' যাঁরা পাকিস্তানী বাংলাকে 'ভারতীয় বাংলা থেকে পৃথক করতে চান' তাঁদের সঙ্গে ড. হক একমত নন। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন: 'মার্কিন জাতির ভাষা ইংরেজ জাতির ভাষা হুবহু না হোক প্রায় অনুরূপ একটা চেহারা নিয়েও মার্কিন জাতির সাহিত্য ইংরেজ জাতির সাহিত্য থেকে পৃথক।' রাষ্ট্রগত এবং জাতিগত আদর্শের পার্থক্যই এর কারণ।[২০] স্মরণ করা যেতে পারে যে বাংলা একাডেমীর চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে জনাব মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্ মার্কিন সাহিত্যের একই উদাহরণ দিয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন বাংলাভাষায়, একইভাবে, 'একটা ঐতিহ্যবাহী মুসলিম জাতির প্রাণস্পন্দন ও জীবন আলেখ্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর হবে না কেন?'[২১] এ-প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্য 'বাংলা ভাষায় আমরা পূর্ব বাংলার প্রাণ, পূর্ব বাঙ্গালীর রুহ প্রবেশ করাইতে চাই।' তিনিও সাহিত্যে একটি সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক পরিসরের বৈচিত্র্যসুষমা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আভাসিত দেখেছেন।

উক্ত ভাষণে ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেছিলেন: 'ভারতের মৌলিক আদর্শ ধর্মসম্পৃক্ত ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং তার বিঘোষিত আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ নীতিবাদ সেহেতু ভারতীয় মানসে একটা আদর্শ-সংঘাত, একটা নৈতিক দ্বন্দ্ব আন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বিরাজমান।'... পশ্চিম বঙ্গের বাংলা সাহিত্য এই 'সংঘাত'কে উপেক্ষা করতে পারেনি। মৌলিক

ও বিঘোষিত আদর্শ পাকিস্তানে এক হওয়ায় এখানে কোন আদর্শের সংঘাত নেই। এই ভাষণে তাঁর শেষ কথা: 'আমাদের সাহিত্যে পূর্ব পাকিস্তান যতটুকু সত্য তার চেয়ে অধিক সত্য পাকিস্তান।' সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি একথা স্মরণ রাখবার অনুরোধ জানান। এখানে বরকতুল্লাহ্ বা আবুল মনসুর আহমদের সঙ্গে তাঁর বিরাট কোন মত-পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। তবে গোলাম মোস্তফা এবং ফররুখ আহমদের সঙ্গে যে নীতিগত পার্থক্য তা পুরোপুরি বিদ্যমান আছে।

২২.১১.৫৯-এ আবুল ফজল সংবর্ধনা বক্তৃতায় একই ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। আবুল ফজলের সাহিত্য ও মানসব্যাখ্যাকারীরা তাঁকে মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা বলে মনে করেন। কিন্তু ড. হক এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন 'আমরা তাঁকে এ সুখ্যাতির হকদার বলে মনে করি না। কেননা যে-ধর্মে তাঁর অটল বিশ্বাস তা একেবারেই নীতিভিত্তিক'। সে ইসলাম। তাঁর মতে, ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইসলামের মূলনীতি ও তাহার বর্তমান প্রয়োগ, বিশেষত আমাদের কুসংস্কারাছন্ন ইসলামপ্রীতিই আবুল ফজল সাহেবের স্পর্শকাতর মনে একদিন চৌচিরের পৃষ্ঠায় যে স্পন্দন জানায় তাই তাকে করেছে সাহিত্যিক।... 'তাঁর সাহিত্যপ্রেরণার মূল উৎস ধর্ম এবং এই ধর্ম একান্তই নীতিভিত্তিক ইসলামধর্ম।'[২২] এটি ড. হকের ব্যক্তিগত পূর্ব-ধারণা—সাহিত্যভাবনার স্বাভাবিক বা নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্ত নয়।

আবুল ফজল এবং ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মধ্যে ছিল অসাধারণ অন্তরঙ্গতা। উভয়ে উভয়কে নিবিড়ভাবে জানতেন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা শিল্পীর কতিপয় ব্যক্তিগত আচরণ তাঁর সাহিত্যবিচারের সেরা মানদণ্ড হওয়া উচিত নয়—সেক্ষেত্রে বিচারদৃষ্টি এবং রীতিপদ্ধতি প্রয়োগই শ্রেয়। সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজলের ধ্যানধারণার মধ্যে মুক্ত-বুদ্ধির প্রবণতাই মুখ্য বলে সমালোচক মহল মনে করেন। বর্তমান ভাষণ সেই রায় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

আবুল ফজল শিখা গোষ্ঠীর অন্যতম পুরোধা এই অর্থে তিনি মুক্তবুদ্ধির সাধক। তাঁর উপন্যাস নাটক এবং প্রবন্ধমালায় সংস্কারমুক্ত জীবনচেতনা সক্রিয়; তিনি ইসলামের মূলনীতির প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন

সেটা যেমন সত্য তেমনি আরও সত্য এই যে সব কিছুকেই যুক্তি এবং বিবেক দিয়ে বুঝবার প্রয়াসী ছিলেন; তাই ড. হকের তাঁকে ফ্রি-থিংকার বলা 'মোটা বুদ্ধির পরিচায়ক' মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত আবুল ফজল জ্ঞানমার্গীয় আদর্শবাদী ছিলেন ঠিকই তবে 'বঙ্কিমের মত নীতিভিত্তিক আদর্শবাদী' ছিলেন বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাও পুনর্বিবেচনাযোগ্য। ড. হকের মন্তব্য দুটি আবুল ফজলের চেতনার প্রকৃতি উদঘাটন করে না। 'সমকালীন চিন্তা' এবং 'আমি যদি প্রধানমন্ত্রী হইতাম'-এর লেখককে যখন ব্যক্তিগত জীবনে অ-গণতান্ত্রিক শক্তি'র সহায়ক হতে দেখা যায় তখন মুক্তবুদ্ধির সাধক এবং নীতিভিত্তিক ইসলামী আদর্শ পদের বিশেষত্ব বিদ্যমান থাকে বলে মনে হয় না। আবুল ফজলের সাহিত্য ও মানসবিচারের ক্ষেত্রে ড. হকের এ-মূল্যায়ন একেবারে প্রথম পর্যায়ের। তাই খানিক আচ্ছন্নতা থাকা স্বাভাবিক।

বায়ান্ন-উত্তরকালে ড. হকের ভাষণগুলোর মধ্যে অতিরিক্ত ইসলামী ঝোঁক লক্ষ্য করি। ধর্ম নিয়ে কিছু বাক-বিতণ্ডা ইতঃপূর্বে ঘটেও গেছে। একালে তাঁর মধ্যে উনিশ শতকীয় র‍্যাশনালিজম এবং 'ইসলামী মূলনীতি প্রয়োগ'-প্রবণতা একটু ভিন্নরকমের লাগে। অতিরিক্ত সতর্কতার বোধ যেন নওরোজ এবং আবুল ফজল ভাষণে সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। এর জের চলেছে ষাটের দশকের প্রথম পর্যায়েও। তবে এ-দশকের ভাষণগুলো বিশেষরূপে শৈক্ষিক স্বভাবের।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রধান হিসেবে কর্মরত থাকা কালে তিনি 'শাহ মখদুম ছাত্রাবাসের'[২৩] প্রাধ্যক্ষ ছিলেন। ছাত্রাবাসের সংসদ কর্মকর্তাদের অভিষেক উপলক্ষে ১৯৬৩ সালের ২২শে মার্চ তিনি প্রাধ্যক্ষের ভাষণ দান করেন। ছাত্রাবাসটির নামকরণ একজন সুফি-র নামানুসারে করা হয়েছে—এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি শিক্ষার্থীদের সে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার আহ্বান জানান। সুফির আদর্শ 'অজ্ঞানকে জ্ঞানদানের আদর্শ, স্বার্থপরকে পরার্থপর করার আদর্শ, সংস্কারবদ্ধ মানবকে সংস্কারমুক্ত করার আদর্শ'...'পীড়িত ও পতিত মানবতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করে অজানাকে' জানার আদর্শ।'[২৪] ছাত্রাবাসের নামের আদর্শ ছাত্রদের আদর্শবান করে তুলুক। সমাজ, জাতি, দেশ ও মানবসেবার আদর্শ তাদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

এই ছাত্রাবাস নির্মাণের মাধ্যমে অনাগত দিনে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভুবনমোহন রূপেরও তিনি স্বপ্ন দেখলেন তা পরবর্তী বিশ বছরের মধ্যে অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়েছে।

একই বছরে (১৯৬৩) বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি নব-বর্ষ (১৩৭০) উৎসবে ভাষণ দেন। প্রসঙ্গত তিনি এ-উৎসবের উদ্ভব ওবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন এবং বাঙালি জীবনে এ-উৎ-সবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। বাঙালির জাতিসত্তার প্রতি তার আকুতি প্রকাশিত হয়েছে। একটি রুচিবান ঐশ্বর্যশালী জাতি হিসেবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনৈতিক সুষ্ঠু তৎপরতা প্রয়োজন--এই প্রসঙ্গটি চট্টগ্রামে বিপনি বিতান কেন্দ্রে 'বইঘর'-এর নতুন শাখা উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে (১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫) উপলব্ধি করা যায়।

'বইঘর' একটি পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এ-ধরনের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে একদিকে আছে ব্যবসায়িক মন অন্যদিকে সংস্কৃতি-সচেতন প্রবণতা। তাই, এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালককে উদ্বোধনী ভাষণ দিতে দাওয়াত করায় ড. হক আপাতত তাদের 'বিষয়বুদ্ধির' প্রশংসা করতে পারেননি। যেখানে প্রয়োজন ছিল সরকারের আমদানি-রপ্তানি বিভাগের কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সেখানে একজন অবৈষয়িক মানুষকে ডেকে কর্তারা বিষয়বুদ্ধির অপচয় ঘটিয়েছেন বলে ড. হক উপভোগযোগ্য হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। এই ভাষণটি এ-সব কারণে আমাদের দেশে একটি ব্যতি-ক্রমধর্মী ব্যাপার।

পরিহাসপ্রিয়তা আর একধাপ চড়িয়ে ড. হক বলেছেন বই ব্যবসায়ে দারুণ ঝুকি---দুনিয়াতে নুনের ব্যবসা, তেলের ব্যবসা, পাটের ব্যবসা এমন কি বাঁদরের ব্যবসাও তো ছিল তা না করে বইয়ের ব্যবসা কেন? পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্য নিয়ে তিনি বলেছেন: বিষ্ণুর পত্নী বিদ্যাদেবী সরস্বতী আর ধনদেবী লক্ষ্মী। দেব-পত্নী হলেও এদের সপত্নীবিদ্বেষ মানবীসুলভ। উভয়ে এক আধারে আশীর্বাদ দিতে পারেন না। বিদ্যার সঙ্গে তাই বিত্তের (বাণিজ্যের) বিরোধ। পরিহাসের সঙ্গে সঙ্গে বেদনার্ত হয়ে তিনি উচ্চারণ করেন 'ব্যবসায়ীর মধ্যে বই ব্যবসায়ীই, বোধ হয় সব চাইতে গরীব, তাই উপেক্ষিত ও নিকৃষ্ট—

অন্ততঃ আমাদের দেশে।[২৫] ব্যবসায়িক লাভালাভের ঊর্ধ্বে বইপ্রসঙ্গে তিনি মহৎ চেতনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:

> সুখে-দুঃখে, সুন্দরে-কুৎসিতে ভালোমন্দে মানুষের জীবন; আর এক একটা বই এক একটা জীবনের প্রতিবিম্ব। অনন্ত মানুষের অফুরন্ত জীবন নিয়েই মানুষের পরিপূর্ণ মহাজীবন...এ জীবনের সাক্ষাৎ পরিচয় এক মানবজীবনে সম্ভব নয়। কেবল বই পড়েই মানুষ তার পরিপূর্ণ জীবনের একটা ইঙ্গিত লাভ করতে পারে।...তাই বই পড়ে আত্মার অতৃপ্তবাসনা তৃপ্ত করতে হয়।[২৬]

উপসংহারে এ-মহৎ ব্যবসার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তিনি উচ্চারণ করেন: 'বই ব্যবসা অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণ ও সুন্দর করে তোলার ব্যবসা...একটা জীবনশিল্প, একটা জীবনসাধনা।' সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যেমন সহজ কথা নয় এ ব্যবসায়ের আদর্শ বজায় রেখে ব্যবসায়ী হওয়াও কঠিন ব্যাপার। বই ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে মানবাত্মার তৃপ্তি সাধিত হোক এই তাঁর পরম কামনা।

গ্রন্থ জগতের সমৃদ্ধি—জীবনের সঙ্গে বইয়ের ঘনিষ্ট সংযোগ স্থাপনের সাধনা ড. হকের জীবনসাধনার এক বিশিষ্ট অধ্যায়। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে একথার সমর্থন মিলবে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত সময়ে এক্ষেত্রে তাঁর একনিষ্ঠ তৎপরতা জাতির মানস-সমৃদ্ধির প্রতি উৎসর্গীত মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সপ্তাহ-ব্যাপী 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি মেলা'-য় তিনি মূল সভাপতির ভাষণে (৯.৮.৬৫) বলেছিলেন 'মেলা মানুষের সাথে মানুষের মিলন ঘটায়। মিলনের দ্বারা মানুষ অপরের মধ্যে নিজেকে সঞ্চারিত ও সম্প্রসারিত করে—আপনাতে আপনি বিকশিত হয়··· সসীম মানুষ অসীম সত্তায় পরিণত হয়।'[২৭]

এই ভাষণে সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বিধৃত। ইতঃপূর্বে তিনি রাজশাহী এবং দিনাজপুরে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির মূলে ধর্মীয় আদর্শের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বর্তমান ভাষণে সাংস্কৃতিক প্রগতির যে

ইঙ্গিত দিয়েছেন তা ধর্মীয় প্রেরণার শর্তাধীন নয়। তাকে হতে হবে সমাজ ভিত্তিক বৃহত্তর রূপের অভিব্যক্তি।

এখানে 'আমাদের সাহিত্যে' বলতে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের সাহিত্য বোঝানো হয়নি বরং তা পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য বলেই চিহ্নিত হয়েছে। এই সাহিত্যের অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো পরিমাণের দিক থেকে গত আঠার বছরের সম্পদকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে এতে পরিচর্যার অভাব আছে। শ্রমজাত ফসল অর্থাগমের সহায়ক হলেও তা সাধনার সামগ্রীতে পরিণত হয়নি। সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরের আদর্শপথে পরিচালিত না হলে সাহিত্য ঐশ্বর্য-মণ্ডিত হবে না। আমাদের সাহিত্য এখনো বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ হয়নি—তাই সাধনা এবং পরিচর্যা দুয়েরই প্রতি ড. হক প্রবর্তনা দিয়েছেন।

আমাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধের প্রতি ড. হকের আত্যন্তিক অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নানা কার্যক্রমে তাঁর অংশ গ্রহণের মধ্যে। জাতীয় মেধা এবং জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির প্রাথমিক সোপান শিশুদের মানসপরিচর্যা। এই লক্ষ্যে ২০-২৭ নভেম্বর ১৯৬৬ কেন্দ্র কর্তৃক শিশুগ্রন্থ মেলার আয়োজন করা হয়। এ গ্রন্থ মেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে মেলায় ড. হক যে ভাষণ দেন তার মূল বক্তব্য ছিল:

> পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিশুদের শিক্ষা-ব্যবস্থা হচ্ছে জাতির একটা প্রধান পবিত্র দায়িত্ব। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে যত রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার মধ্যে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থাই হচ্ছে সব চাইতে উপেক্ষিত।[২৮]

এর তিন বছর পর ৯.১০ ৬৮ তে শিশুগ্রন্থ মেলায় প্রধান অতিথির ভাষণে ড. হক বলেন: 'যে দেশে অর্থাভাবে শতকরা ৯০ নব্বইটি ছেলে শরীর ধারণের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য পায় না, সে দেশের কয়টা ছেলে বই কিনে পড়তে পারে?'

সাহিত্য ইসলামী হলো কিনা, এ নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা ক্রমেই কমে যাচ্ছে—মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি তিনি হয়েছেন সচেতন এবং

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় প্রগতিশীল। পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা কর্তৃক (৩০শে মার্চ ১৯৬৭) আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় ড. হক মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[২৯]

চার

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এনেছিল এক অভাবিতপূর্ব পরিবর্তন। পাকিস্তানের মূলনীতির প্রতি পূর্বাঞ্চলের মানুষের সমস্ত আকর্ষণ বিলীন হয়ে গেল। বুদ্ধিজীবী মানুষের মনোরাজ্যে এলো গভীর বেদনা আর উদ্বেগ। বাঙালি নিজস্ব জাতি-সত্তার চেতনায় জেগে উঠল—আপন ঠিকানার অনুসন্ধান করলো পদ্মা-মেঘনা যমুনায়; তার দেশ হলো বাংলাদেশ। ধর্মীয় শাসনের নাগপাশ কেটে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনের জয়গানে জাতির মধ্যে যে নবচেতনার নবক্রম রচিত হতে চললো তার পরিচয় ড. হকের নানা কর্ম ও তৎপরতায় ষাটের দশকের শেষ দিক থেকেই ফুটে উঠতে আরম্ভ করে।

১৩৭৭ সালের বাংলা নববর্ষ (১৯৭০) উপলক্ষে ড. হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ক্লাবে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দান করেন—পরে এটি বিবর্ধিত আকারে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘বাংলা নববর্ষ বা ১লা বৈশাখ’ শিরোনামে।[৩০] বাংলা নববর্ষ-এর বৈশিষ্ট্য এবং তার বিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করে লেখক বলেছেন ‘এতে ধর্মের কোন গভীর প্রভাব নেই’। দ্বিজাতিতত্ত্বের মোহ কেটে যাবার পর বাঙালি তার কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যে জাতিগত নিজস্বতা অনুসন্ধান করতে থাকে। বাংলা নববর্ষের উৎসবের মধ্যে যে আচার-আচরণ খেলাধুলা, খাদ্য-খানা, আনন্দ-উৎসব তার ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী।

> বৈশাখে নববর্ষের আগমনে আমাদের দেশের মানুষের চিত্তে যে চেতনার পরিচয় পাই তাতে ঋতু পরিবর্তনের অমোঘ প্রভাব সূচিত হয়। তাই বলতে হয় বাংলা নববর্ষ আর্তব উৎসব এবং কৃষ্যুৎসবও বটে। এর সাথে ধর্মের কোন সংশ্রব নেই বললেই চলে।[৩১]

অর্থাৎ বাংলা নববর্ষ 'ধর্মনিরপেক্ষ' উৎসব। পাকিস্তানে এই শব্দটি ছিল একশ্রেণীর লোকের কাছে আতংকজনক। তাই ড. হক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এ-শব্দের সারাৎসারই আহরণ করেছেন। যাহোক তাঁর এ-ভাষণ বাঙালির আত্মচেতনা লাভের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান অবদান। মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের জাতিসত্তার প্রকৃত চারিত্র ড. হকের বহু রচনায় বিশ্লেষিত হয়েছে।

১৯৭২-এর ২০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক গ্রন্থ বর্ষোৎসব। স্বাধীন বাংলাদেশে এটিই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক উৎসব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ। আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের শ্লোগান ছিল 'সবার জন্য বই চাই'—এটা কথার কথা নয়। এ হচ্ছে শিক্ষিত সমাজের ব্যাপক আত্মিক চাহিদার বলিষ্ঠ প্রকাশ। এ-চাহিদা মেটানোর উপায় অনুসন্ধানের জন্য আন্তর্জাতিক গ্রন্থ বর্ষোৎসব পৃথিবীর সর্বত্র পালিত হয়েছে।

ড. হক তাঁর ভাষণে প্রশ্ন তুলেছেন বেতারে টি. ভি. চলচ্চিত্র গ্রন্থের অস্তিত্বে ওপর হামলা চালিয়েছে তবু গ্রন্থ কি করে বেঁচে থাকছে বা থাকবে? তিনি নিজেই উত্তর দিয়েছেন: 'গ্রন্থের মুদ্রিত শব্দাবলী তাদের আক্রমণকারীর স্থায়িত্বশক্তির তুলনায় দীর্ঘ। বেতার টি. ভি. চলচ্চিত্র জ্ঞান প্রচারের নতুন উপায় আর গ্রন্থ জ্ঞানের আকর।' তার আত্মরক্ষার মূলমন্ত্র তার নিজের মধ্যেই বিদ্যমান। বই ব্যক্তিজীবনে অকৃত্রিম বন্ধু, জাতীয় জীবনে বিশ্বস্ত দূত ও সত্যিকারের প্রতিনিধি। এই মহৎ বন্ধু-সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ বাংলাদেশে নেই—কেন নেই তার কারণও তিনি নির্দেশ করেছেন।

১৩৮১-র ১লা বৈশাখে (১৯৭৪) গ্রন্থমেলা উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে ড. হক নববর্ষ ভাষণ দান করেন। তিনি বাঙালি জীবনে বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব আলোচনা করেন। গ্রন্থের মূল্য ও তার কল্যাণধর্ম ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন:

> ধনবল, জনবল, অর্থবল, কোন বলই জাতির বড় বল নয়।
> গ্রন্থবলই সভ্য ও শিক্ষিত জাতির একমাত্র অভিজ্ঞান।'

গ্রন্থমেলা 'মানুষের নিকট মানুষকে এবং সেই সূত্রে জাতির কাছে জাতিকে পরিচিত করে। যে জাতি যত গ্রন্থসচেতন সে তত মহৎ।' ড. হকের এসব অভিমত চিরন্তন সত্যরূপে প্রতিভাত, প্রাবাদিক মূল্যবহ। নানা প্রসঙ্গে জীবনের পরম বন্ধু হিসেবে তিনি বইয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নিরক্ষরতা, প্রকাশনা শিল্পের বিপর্যয় এবং মানসিকতা আমাদের গ্রন্থজগতে বিড়ম্বনার প্রধান কারণ।

সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৯৭৩ সালের ২৫শে জানুয়ারি চট্টগ্রামে একটি নাটক আলোচনাচক্রে সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন এখানে নাটক ও রঙ্গমঞ্চের কোন ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়নি। নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিয়ে তিনি '৪৭-উত্তর নাটক প্রসঙ্গে বলেছেন যে একালে যেসব নাটক রচিত হয়েছিল তার বেশিরভাগই ছিল ইসলামী আদর্শ এবং মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণের প্রয়াস। সত্যিকারের নাটক লিখলেন 'ধর্মনিরপেক্ষ তরুণ সম্প্রদায়।' উপনিবেশবাদের ছত্রছায়ায় পরিপুষ্ট ভণ্ডামি, মোনাফেকি, পুজিবাদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হলো তীব্র প্রতিবাদ। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে রচিত হয়েছিল জল্লাদের দরবার। স্বাধীন বাংলাদেশে সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নাট্যসাহিত্যের পরিবর্তন অত্যাসন্ন।

এ-প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ কর্তৃক আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক ইতিহাস সম্মেলনে (১৯১৩) প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ ছিল বিশেষ দিক-নির্দেশকারী বক্তব্য-সংবলিত। বক্তব্যের প্রথম পর্যায়েই তিনি বাঙালি জাতীয়তার কাল-প্রবাহিত সত্তার দ্বিধাহীন অস্তিত্বের আভাস দান করেন। তত্ত্বালোকে ইতিহাসের চারিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে মানুষের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি থেকে ইতিহাসের জন্ম হলেও 'তথ্য নিষ্কাশিত সত্যের প্রচ্ছন্ন স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই' হচ্ছে হাল আমলে ইতিহাস রচনার লক্ষ্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গৃহীত না হওয়ায় তিনি হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। প্রাসঙ্গিক পরামর্শ হিসেবে তিনি বলেছিলেন এ-ইতিহাস হবে আধুনিক বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অংশ। বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে এর সংযোগ রক্ষা করতেই হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা একটি জটিল

ব্যাপক ও গুরুতর কাজ। এর উপাদানের কিছু পরিচয় দিয়ে তা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াগত করবার সমস্যার প্রতিও তিনি আলোক-সম্পাৎ করেন। বস্তুত এ-ভাষণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।

পাঁচ

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সমকালীন বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির এক অসাধারণ প্রতিনিধি ছিলেন ; তাঁর উপর্যুক্ত ভাষণ সমূহ থেকে মনে হয়েছে তিনি আমাদের সাহিত্যের অতীত বর্তমানের সংযোগ রচনা করেছেন—এর গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে তাঁর দিক-নির্দেশনামূলক প্রভাব আমাদের ভাষাসাহিত্যে গভীরতর কল্যাণ দ্যোতনা করেছে।

ড. হক ছিলেন একজন মহান ও দক্ষ শিক্ষাবিদ। আমাদের কোন দূরপ্রসারী কল্যাণমুখী শিক্ষানীতি আজো প্রণীত হয়নি। তার কারণ দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সমতা রেখে, তা কার্যকরী করবার সুযোগের কথা মনে রেখে সত্যিকার কল্যাণমুখী আদর্শ শিক্ষানীতি জাতি আজো পায়নি। এই নীতিনির্ধারণ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের সুযোগ তিনি পেয়েছেন কদাচিৎ। তবে মতামত প্রকাশ ও মূল্যায়নে তিনি মাঝে মাঝে সুযোগ লাভ করেছেন। লিখিত ভাষণগুলো থেকে শিক্ষা-সংকট ও প্রতিকার প্রসঙ্গে তাঁর মতামত বুঝতে পারা যায়। সাধারণভাবে শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, মাদ্রাসাশিক্ষা, মাতৃভাষা শিক্ষণের সমস্যা এসব বিষয়ে তার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান লক্ষ্য করা যায়। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস-জ্ঞান তাঁর ছিল তবে তা কাজে লাগানো গেছে কদাচিৎ।

সময়ের হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে 'বেতার-ভাষণ' তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য বক্তব্য। এই ভাষণে[৩২] তিনি উল্লেখ করেন যে ১৯১৭ সালে গঠিত স্যাডলার কমিশন রিপোর্টে দেশের উত্তরাঞ্চলের উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটাবার জন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ ছিল। সে সুপারিশ ইংরেজ আমলে ছিল ফাইল-বন্দি অবস্থায়। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান আমলে রাজশাহীতে একটি 'যোগবাহ বিশ্ব-বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে

ড. হকের যে ব্যক্তিগত ধারণা ছিল তা এর মহা-পরিকল্পনায় খানিকটা রূপায়িত হয়েছে। তাঁর কিছু বক্তব্য প্রসঙ্গত উল্লেখের দাবী রাখে:

> যদিও আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেশের উত্তরাঞ্চলের শিক্ষা সমস্যার সমাধান এবং এ-এলাকায় সাংস্কৃতিক জ্যোতি বিকরণ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশিষ্ট কর্তব্য, তথাপি জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সাথে সহযোগিতা রক্ষা করে একে দেশের ক্রমবর্ধমান সমস্যাবলীর সমাধান ও উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটাবার দায়িত্বও সামগ্রিকভাবে পালন করতে হবে।

তাঁর এই বক্তব্য অভিনন্দনযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধান করেন ; এর যে বিশ্বজনীন ভাবমূর্তি আছে তার তাৎপর্য ব্যাপক ও গভীর। মহাপরিকল্পনায় তিনি যে আকাঙ্ক্ষিত কাঠামো পেয়েছিলেন তাতে অপরিহার্য দালান, ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ, ভৌমিক দৃশ্যপট, আবহাওয়াগত আবশ্যকতার দাবী পূরণ করা হয়েছিল।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এ-তিনেরই অভিজ্ঞতা ছিল ড. হকের। আলোচ্য বেতার ভাষণে ধরা পড়েছে তাঁর শৈক্ষিক প্রশাসনের অভিজ্ঞতা এবং ভাবনার বিশেষত্ব। ১৯৬৮ সালের ১৫ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্রে পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষকদের জন্য আয়োজিত প্রথম স্বল্পকালীন শিক্ষণ অনু-ষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান আলোক-পাত করেন। ভাষণের ভূমিকাতে তিনি বলেন: 'শিক্ষা আমাদের দেশে তার প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নয়। আগে যেমন এখনো ঠিক তেমনিই শিক্ষা একটা বে-দরকারী বিষয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। তবে, আমরা এখন শিক্ষাকে তার প্রকৃত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছি।'

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসক, শিক্ষক, ছাত্র, জনগণ পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করতে করতে যে পঙ্কিল আবর্তের সৃষ্টি করেছে তার হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি? তাঁর উত্তর: এ জটিল সমস্যা সমাধানের চাবি কারো একার হাতে নেই, তবু এর সমাধানের প্রথম অধিকার ও সুযোগ যদি কারো থাকে তা রয়েছে শিক্ষকের...একমাত্র শিক্ষকই

মানুষকে মানুষরূপে গড়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছেন। এ-ব্রত থেকে যিনি বিচ্যুত তিনি শিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বন করে শিক্ষক নামে পরিচিত হলেও, শিক্ষাব্রতী নন। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার বাহন হচ্ছে বাংলা আর এই বাংলা নিয়েই দেখা দিয়েছে নানান জটিলতা। যেমন ভাষা সংস্কার, বর্ণমালা সংস্কার, ব্যাকরণ সংস্কার ইত্যাদি। এসব করে সমস্যার সমাধান হবে না বলে তিনি মনে করেন।

১৯৭০ সালের শিক্ষা সপ্তাহে প্রধান অতিথির ভাষণে দেবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন---উদ্বোধনী বা সভাপতি বা প্রধান বক্তা রূপে নয়-----'বিচিত্রা' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন মনের মুক্তির জন্য শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন সহজতর উপায় নেই। আর যে শিক্ষা এই মুক্তি আনতে পারে না তা নিষ্ফল এবং শিক্ষা নামের অযোগ্য। সেদিন দেশে প্রচলিত শিক্ষার নিষ্ফলতা সম্পর্কেই তার এ বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তার কোন পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যায় না।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ভাষণ 'বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সংস্থা এবং মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ'। এতে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে তিনি বেকার সৃষ্টির কারখানা, আলবদর-আল-শাম্‌স্‌ প্রভৃতি নরঘাতক সৃষ্টির উৎস, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধী বলে অভিহিত করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মীয় শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় বলে ঐ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাকে নাকচ করে দেন। ড. হক মনে করেন ধর্মীয় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা এক নয়:

> মাদ্রাসায় আরবী, ফারসী, উর্দু শিখে আলিম ধর্মজ্ঞ ও ধার্মিক হবে একথা সত্য নয়। তা যদি হতো নিকলসন, আরবেরী স্টিঙ্গেস এমন কি ভাই গিরিশচন্দ্র, মৌলানা মাখনলাল ও ড. হরেন্দ্রচন্দ্র লাল ধার্মিক ও ধর্মজ্ঞ মুসলমান হতেন এবং সংস্কৃত শিখে অতীতের মহাপণ্ডিত আলবেরুনী এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হতেন।...আসলে ফিক্‌হ ও উসূল শাস্ত্রের এবং তার মৌল উৎস হিসেবে কুরআন ও হদীস গ্রন্থের শিক্ষাকেই ধর্মীয় শিক্ষা বলা হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন একথা বললে যারা আঁৎকে ওঠেন ড. হক তাঁদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। দেশে প্রচলিত বিচিত্র ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা লক্ষ্য করে তিনি বলেন:

> আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠেছে একজন থেকে অন্যজনকে আচার-ব্যবহারে, ধর্মে-কর্মে এমন কি সমগ্র জীবনযাপন পদ্ধতিতে পৃথকীকরণ। অথচ শিক্ষার মূল পরিণতি হচ্ছে মানুষে মানুষে মিলন ঘটানো।

কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থা সৃষ্টি করছে 'পর্বতপ্রমাণ বিচ্ছিন্নতা'। তিনি তিনি মনে করেন মাদ্রাসাশিক্ষাকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নেয়ায় এই 'বিচ্ছিন্নতা-বাদী মানসিকতা'র জন্ম দিয়েছে'। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে বিন্যস্ত করবার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগী হবার আহ্বান জানিয়েছেন। এ-ভাষণের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিক-নির্দেশ ছিল কিন্তু সংস্কারবদ্ধতার কারণে একে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি তবে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে এবং প্রয়োজন উপলব্ধি হয়েছে।

বাংলাদেশশিক্ষা প্রকল্প ও উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা-র দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় (২৪.১.১৯৭৬) প্রদত্ত ভাষণটি সংক্ষিপ্ত অথচ সাহসী। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন 'শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক রাজনীতি একটা আত্মঘাতী নীতি।'...'সে রাজনীতির মতো কোন সপত্নীর উপস্থিতি স্বগৃহে সহ্য করে না।' আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে পুরাতন এবং জটিল সমস্যার সমাধান করতে হলে, প্রয়োজন দীর্ঘ, ব্যাপক ও স্বতঃ-প্রবৃত্ত গবেষণা। ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় শিক্ষা পরিবেশ' সেমিনারে তিনি এই জটিলতা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেন। সমস্যার ফিরিস্তির চেয়ে সমাধানের পথ-নির্দেশকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। শিক্ষাসংস্কার প্রতিবেদন ইতঃপূর্বে কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারেনি। 'রাজনৈতিক শিদ্ধান্তে শিক্ষানৈতিক সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টাই এর একমাত্র কারণ বলে' ড. হক মনে করেন।[৩৩] শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষানীতি প্রণয়নের পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলে তা কল্যাণ আনবে না এবং কার্যকরীও হবে না।

যে পরিবেশে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা পাশ্চাত্য শিক্ষা—এর সঙ্গে খানিক মাদ্রাসা এবং খানিক টোল ব্যবস্থা যুক্ত হয়ে এক কিম্ভূতকিমার অবস্থার সৃষ্টি করেছে। দেশের প্রাকৃতিক পটভূমি, আর্থসামাজিক কাঠামো, শিক্ষার আবশ্যকতামূলক দৃষ্টিকোণ এবং ধর্মীয়-ঐতিহাসিক অবস্থা শিক্ষাব্যবস্থার জরুরি অনুষঙ্গ—এটা ভুলে গিয়ে শিক্ষাসংস্কার করতে গেলে বিভ্রাটের আশঙ্কা থাকবেই।

ছয়

ভাষা সাহিত্যের গবেষক ড. মুহম্মদ এনামুল হক শেষ বয়সে শিল্প এবং শিল্পতত্ত্ব প্রসঙ্গেও কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন ভাষণ এবং অভিভাষণরূপে। চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত (২৩ অক্টোবর, ১৯৬৭) 'ইস্কুল শিশুর চিত্র প্রদর্শনী'তে ব্যবস্থাপনা সমিতির সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত ভাষণে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের চিত্রাংকন প্রবণতা, তার লালন ও প্রতিযোগিতা বিষয়ে তিনি মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

শিশুশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের চিত্রাংকনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া তাঁর মতে প্রয়োজন। তিনি প্রসঙ্গত বলেছেন যে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে শিশুদের চিত্রাংকনবিদ্যা শিক্ষা এবং চিত্রপ্রদর্শনী করা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এ-দেশে এ-বিদ্যা একান্ত অনুন্নত অবস্থায় আছে। শিক্ষার বেলায় যত্ন-প্রয়াস নেই অথচ পরীক্ষার বেলায় যথেষ্ট গুরুত্ব। স্কুলে তাদের চিত্র অনুকরণ করতে দেওয়া হয়—এতে শিশুর প্রতিভাবিকাশে স্বাভাবিকতা ও মৌলিকতা অনেকাংশে বিনষ্ট হয়ে যায়। শিশুর চিত্র-বিদ্যা লাভের পথে 'সামাজিক গোড়ামি' বিশেষ অন্তরায়। চিত্রবিদ্যার শিক্ষকেরও এতটা অভাব যে প্রতিটি স্কুলে চিত্র-শিক্ষক পেতে পারি না।

প্রদর্শনীর গুরুত্ব সম্পর্কে ড. হকের মন্তব্য: 'শিশুকে আবিষ্কার করার জন্যই শিশুচিত্র প্রদর্শনী খোলা হয়ে থাকে।' তিনি এক্ষেত্রে একটি দুঃখজনক ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। প্রদর্শনীতে অনেক নকল ছবি এসেছে—এগুলো প্রেরিত হয়েছে স্কুলের প্রধানশিক্ষক এবং চিত্রশিক্ষক কর্তৃক। তাঁদের এ গর্হিত কাজের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করে ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন।

ঢাকায় 'রুমানিয়া ফটোপ্রদর্শনী'র উদ্বোধনী (৩১শে মে, ১৯৬৮)-তে ভাষণদানের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এখানে ড. হক প্রাঞ্জল ইংরেজিতে একটি উপভোগ্য ভাষণ দান করেছিলেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিন বলেন :

> Being the most reliable representatives of objects, lands and people, the position of photographs is unique in the sense that it can speak for a country most faithfully....Science has joined hands with art to win over the head and heart of Pakistan. No ambassader representing his country could, I am Sure, perform this job half as good.

অর্থাৎ ফটোগ্রাফি বস্তু দেশ ও মানুষের নির্ভরযোগ্য প্রতিবিম্ব বলে একটি দেশের পক্ষে সে বিশ্বস্তরূপে কথা বলতে পারে। পাকিস্তানের মস্তিষ্ক এবং মন জয় করতে বিজ্ঞান শিল্পের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে কোন রাষ্ট্রদূতই একাজের অর্ধেকের বেশি সম্পন্ন করতে পারতেন না।

চিত্র এবং চারুশিল্পের প্রযুক্তিগত আলোচনায় না গিয়েও এর প্রাসঙ্গিক কল্যাণকর ভূমিকার প্রতি তিনি যে গুরুত্ব দিয়েছেন তা উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং হৃদয়স্পর্শী। পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলে (ঢাকা) ১৯৭১ সালের ২৪শে জানুয়ারি চারুশিল্পী কাজী গিয়াসুদ্দীনরে ছবি প্রদর্শনী উপলক্ষে 'একব্যক্তিক জলরঙা ছবির প্রদর্শনী দ্বারোদ্ঘাটন ভাষণ' শীর্ষক বক্তৃতাটি একদিকে শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক অন্যদিকে সমাজ-সচেতনার প্রতীক। তাঁর মতে 'প্রতিভা পরিবেশের সৃষ্টি 'এবং 'পরিবেশ সামাজিক তৎপরতা'র ফল। তিনি মনে করেন, পিকাশোর মতো না হোক জয়নুল আবেদীনের মতো শিল্পীরও আর জন্ম হচ্ছে না এর কারণ সামাজিক আনুকূল্য এবং পরিবেশের পরিচর্যার অভাব। শিল্পের প্রতি ড. হকের এই অনুভূতি এবং আগ্রহ মুক্তবুদ্ধির সমার্থক। জল-ছবি এবং জল-রং ছবির প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তিগত বিশেষত্ব নিরূপণ অবশ্যি মূল্যবান সমজদারিত্ব। তিনি শিল্পীর প্রয়াস ও নিষ্ঠার প্রতি যে সপ্রশংস কৌতূহল প্রকাশ করেছেন তা তাঁর প্রতি গভীর প্রেরণাদায়ী।

শিল্পের প্রতি তাঁর কৌতূহল কখন কিভাবে জাগ্রত হয় তা সঠিকভাবে বলতে পারি না তবে মিশরীয় ভাস্কর মুখতার সম্পর্কে প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ[৩৪] সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম রচনা। এরচনায় তিনি শিল্পের কলানৈপুণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সাত

এখানে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের কতকগুলো প্রধান ভাষণ আলোচিত হলো। অধিকাংশই ক্ষেত্রেই তিনি মৌখিক ভাষণ দিতেন। বাগ্মী বলতে যা বুঝায় তিনি তা ছিলেন না—তিনি ছিলেন সুবক্তা। পরিমিত, বুদ্ধিদীপ্ত এবং সরস ছিল তাঁর বক্তৃতাসমূহ। লিখিতই হোক বা মৌখিকই হোক তাঁর বক্তৃভামালা ছিল শৈক্ষিক স্বভাবের—তিনি ছিলেন জ্ঞানী এবং জ্ঞানপিপাসু তাই কথায়, কর্মে, বক্তব্যে, চিঠিপত্রে একটি জ্ঞানপিপাসু মন এবং শিল্পীসুলভ বাণীভঙ্গি তাঁর প্রতি বাক্য-বন্ধে লক্ষ্য করা যায়।

ভাষণগুলোর প্রধান বিশেষত্বই হলো যুক্তিময়তা—শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তিনি ক্রমাগত আপন যুক্তি উপস্থাপন করতে থাকেন। মত প্রতিষ্ঠার কারণে যুক্তিকে তিনি নানা শাস্ত্র থেকে উদাহরণ দিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলেন—তাঁর যুক্তি, তর্কের নিরেট তালিকা নয় বরং ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে আহৃত উদাহরণের দ্বারা পরিপুষ্ট। বুদ্ধি এবং যুক্তির দ্বারা তিনি তাঁর শ্রোতাকে মতাশ্রয়ী করে তুলতে সক্ষম ছিলেন। এগুলো অন্যের মতের সারাৎসার নয় আপন মতের শাণিত প্রকাশ।

ড. হকের বক্তব্যে ভাষার আড়ম্বর নেই। বক্তব্যই তাঁর কাছে প্রধান তবে প্রকাশের বাহন ভাষাশৈলীর প্রতিও ছিল তাঁর সদাজাগ্রত মনোযোগ। বক্তব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি ভাষাকে সেই বিশিষ্টভঙ্গিতে নির্মাণ করতেন। বক্তৃতায়ও ব্যাকরণ-শৈথিল্য ঘটতে দেখা যায়নি। সাধুশৈলীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল সত্য, তবে জীবনদৃষ্টির সচল আবেগ এবং অগ্রগামিতা তাতে বিনষ্ট হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। চলতি শৈলীর ব্যবহার তাঁর রচনা এবং ভাষণে বিরাটস্থান জুড়ে আছে তবে ভাষাকে বিষয়ানুসারী করাই ছিল

এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধগুলো চলিত ঢং-এ লেখায় তিনি অ-খুশী হতেন।

বিষয়চেতনা, শ্রম ও ভাষাগত কারণে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের ভাষণ-অভিভাষণগুলো, তাঁর অন্যান্য রচনার মতই, বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী সম্পদরূপে বিবেচিত হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ মুহম্মদ এনামুল হক, চট্টগ্রাম জিলা সম্মিলনী (রাউজান অধিবেশন) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ, মোহাম্মদী প্রেস, ১১ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, ১৯৩৩. পৃ. ১০

২ তদেব

৩ তদেব পৃ. ১২

৪ তদেব পৃ. ১৪

৫ তদেব পৃ. ২-৩

৬ ওহীদুল আলম, পৃথিবীর পথিক, প্র-প্র চট্টগ্রাম ১৯৭২, পৃ. ১৯৩

৭ মুহম্মদ এনামুল হক, পূরবী সাহিত্য সম্মেলন (চাটিগাঁও অধিবেশন) ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ. ১৯৩৭, পৃ. ২-৩

৮ ক. পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, চট্টগ্রামের ইতিহাস, ১৯২০, পৃ. ১

খ. আবদুল হক চৌধুরী, শহর চট্টগ্রামের ইতিহাস, প্র-স চট্টগ্রাম ১৯৮৫, পৃ. ১

৯ মুহম্মদ এনামুল হক, রামকৃষ্ণের অমর বাণী ও বর্তমান বাংলাদেশ, ১৩.৯.১৯৪৩, হস্তলিখিত কপি।

১০, ১১ তদেব পৃ. ৫

১২ মুহম্মদ এনামুল হক, নজরুলের ত্রিপঞ্চাশোত্তম জন্মতিথি ২৬শে মে, ১৯৫১, ভাষণ।

১৩ তদেব হস্তলিখিত কপি পৃ. ৫

১৪ মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের ধারা (প্রবন্ধ), জিন্নাহ ইসলামিক ইনস্টিটিউট বার্ষিকী, রাজশাহী, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫১ (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ) পৃ.৭

১৫ তদেব পৃ. ৮

১৬ তদেব পৃ. ৯

১৭ দ্র. গোলাম মোস্তফা পরিচালিত নওবাহার ৩ : ৪-৫ পৌষ-মাঘ ১৩৫৮, পৃ. ১৯০-৯৯; ফাল্গুন ১৩৫৮; মওলানা আকরম খাঁ-র দৈনিক আজাদ ২৪.১১.৫৭

১৮ মুহম্মদ এনামুল হক, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, টাইপ কপি, ১৯৫৫, পৃ. ৫

১৯ দীনেশ চন্দ্রসেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সং কলকাতা ১৯২৭, পৃ. ৫৩

১৯ক নওরোজ সাহিত্য মজলিসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নওরোজ সাহিত্য-সম্মেলন দিনাজপুর, ১১ই অকক্টবর ১৯৫৮, সভা-পতির ভাষণ, হস্তলিখিত কপি পৃষ্ঠা ১৫। ভাষণটি কোথাও মুদ্রিত হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই।

২০ তদেব পৃ. ১৯

২১ বরকতুল্লাহ: বাংলা একাডেমীর চতুর্থ বার্ষিক সভায় প্রদত্ত ভাষণ, দ্র. বাংলা একাডেমী পত্রিকা ৭ : ২ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০, পৃ. ১২৫

২২ ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল ফজল সংবর্ধনা, হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি; পৃ. ১৭। দ্র. সমকাল, মাঘ ১৩৬৬

২৩ ড. হক শাহ মুখদুম হল-এর প্রাধ্যক্ষের ভাষণ (২২ মার্চ ১৯৬৩) রচনা করতে গিয়ে এর শিরোনামা লিখেছেন "শাহ মখদুম হল'-ছাত্রাবাসের" ছাত্রসংসদ কর্মকর্তাদের প্রথম অভি-ষেক। 'হলে'র সঙ্গে 'ছাত্রাবাস,' শব্দ প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

২৪ শাহ মখদুম হল বার্ষিকী ১৯৬২-৬৩

২৫ আলোচ্য ভাষণটি দি আর্ট প্রেস চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত, পৃ. সং ৮

২৬ তদেব পৃ. ৬

২৭ ড. মুহম্মদ এনামুল হক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মেলা, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা ৯.৮.১৯৬৫, মূল সভাপতির ভাষণ, টাইপ-কপি, পৃ. ১

২৮ মাসিক বই ২ : ১১ সং, পৃ. ৪৭০

২৯ তদেব ৩ : ২, পৃঃ ৮৬—৮৭

৩০ ড. মুহম্মদ এনামুল হক, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা, ১ : ২, শরৎ ১৩৭৭ পৃ. ১-১৯

৩১ তদেব পৃ. ১৮

৩২ অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭

৩৩ জাতীয় শিক্ষা পরিবেশ সেমিনার ১৯৭৮, সাংগঠনিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৭৮, পৃ. ৩

৩৪ ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুখতার ও মিশরের নবজাগরণ (প্রবন্ধ), প্রবাসী ৩১ : ১, শ্রাবণ ১৩৩৮ পৃ. ৫২৩-৫২৯

৩৫ সৈয়দ আলী আহসান, সতত স্বাগত, প্র-প্র ঢাকা ১৯৮৩,পৃ. ৪২